অধ্যায় ৩

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ
[Salient Features of the Indian Constitution]

অধ্যায়সূচী

∫∫ ① ভূমিকা ② ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ∫∫

৩.১ ভূমিকা (Introduction)

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য আলোচনার গুরুত্ব ∫∫ সকল দেশের দসংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য একরকম হয় না। প্রত্যেক দেশের সংবিধানের কতকগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয়তা থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকেই সংশ্লিষ্ট সংবিধানের যথার্থ স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। তা ছাড়া, এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে একটি সংবিধানের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংবিধানের তুলনামূলক আলোচনা করা সম্ভব হয়। এতে সংবিধানের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সহজে ধারণা লাভ করা যায়। এই কারণে যে-কোন দেশের সংবিধান পাঠের শুরুতেই তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ভারতের সংবিধানও এক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম নয়।

ভারতের সংবিধানে কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। তার ফলে এই সংবিধান স্বাতন্ত্র্য লাভে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ সংবিধানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করেন। তাঁরা বিভিন্ন সংবিধান থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করেছেন। বস্তুতঃ ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবিধানের শ্রেষ্ঠ অংশগুলিকে নিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট শাসনব্যবস্থার বাস্তব ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে বাদ দিয়ে। জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য দেশের সংবিধানের সুবিধাজনক বিষয়গুলিকে ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ড. আম্বেদকর (Dr. B. R. Ambedkar) গণপরিষদে বলেছেন : ''The only new things, if there can be any, in a constitution framed so late in the day are the variations made to remove the faults and accommodate it to the needs of country.''

ভারতীয় সংবিধানের উৎস ∫∫ পৃথিবীর বহু দেশের সংবিধান থেকেই ভারতের সংবিধান রচয়িতারা উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কয়েকটি দেশের সংবিধানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের সংবিধানের কোন কোন বিষয়ের উপর মার্কিন সংবিধানের প্রভাব খুব বেশী। আবার নির্দিষ্ট কতকগুলি ক্ষেত্রে ভারতের সংবিধান পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আয়ারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থাকে অনুসরণ করেছে। তবে গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন ভারত শাসন আইন, বিশেষত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনই হল স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধানের প্রধান উৎস। বি. এন. রাউ (B.N.Rau) ছিলেন গণপরিষদের সাংবিধানিক পরামর্শদাতা। তিনি বিভিন্ন দেশ পরিক্রমা করার পর গণপরিষদের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। সংবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে এই প্রতিবেদনটিও গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়েছে। আবার সকল শাসনব্যবস্থায় লিখিত ও বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুনের সঙ্গে সঙ্গে বহু ও বিভিন্ন অলিখিত নিয়মকানুন থাকে। এই সমস্ত প্রথা ও রীতিনীতিগুলি দেশের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের শাসনব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতিগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আইভর জেনিংস (Sir Ivor Jennings)-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : ''The machinery of Government is essentially British and the whole collection of British Constitution's conventions has apparently been incorporated as conventions.'' এই সমস্ত কারণের জন্য ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় সংবিধান-বিশেষজ্ঞ শ্রী দুর্গাদাস বসু (D. D. Basu) মন্তব্য করেছেন : ''The Constitution of India is remarkable for many outstanding features which will distinguish it from other constitutions even though it has been prepared after ransacking all the known constitutions of the world.''

৩.২ ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main Features of the Indian Constitution)

ভারতীয় সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Scanned with CamScanner

(১) বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান ।। ভারতীয় সংবিধান বিস্তারিতভাবে লিখিত। অন্যান্য দেশের লিখিত সংবিধানের তুলনায় এই সংবিধান আয়তনে বড় এবং বিষয়বহুল। ৩৯৫টি ধারা (Articles), বহু উপধারা (Clauses) এবং ৮টি তালিকা (Schedule) নিয়ে ভারতীয় সংবিধানের সৃষ্টি। তারপর ১ম সংবিধান সংশোধন (১৯৫১)-এর দ্বারা নবম তালিকা এবং ৩৫তম সংবিধান সংশোধন (১৯৭৪)-এর দ্বারা দশম তালিকা (সিকিমকে ভারতের সহযোগী রাজ্যের মর্যাদা) সংযুক্ত হয়। ১৯৭৫ সালে ৩৬তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা দশম তালিকা (সিকিম সম্পর্কিত) বিলুপ্ত করা হয় এবং সিকিমকে ভারতের অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী আইন (১৯৭৬)-এর মাধ্যমে দুটি নতুন অধ্যায় সংযুক্ত হয়। একটি হল ৪-ক (Part IVA) এবং দ্বিতীয়টি হল ১৪-ক (Part XIVA)। প্রথমটিতে নাগরিকদের কর্তব্য এবং দ্বিতীয়টিতে ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। ৫২তম সংবিধান সংশোধন (১৯৮৫)-এর দ্বারা আবার দশম তালিকা (দলত্যাগ সম্পর্কিত বিধান) সংযুক্ত হয়। ১৯৯২ সালে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা একাদশ তালিকা (পঞ্চায়েত সম্পর্কিত) এবং ৭৪তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা দ্বাদশ তালিকা (মিউনিসিপালিটি সম্পর্কিত) সংযুক্ত করা হয়। সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর কিছু ধারা বাদ দেওয়া হয়েছে। তেমনি বহু ধারা সংযুক্ত হয়েছে। তার ফলে বর্তমানে গাণিতিক বিচারে সংবিধানের মোট ধারার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৪৭। তবে এখনও ভারতীয় সংবিধানের সর্বশেষ ধারাটি হল ৩৯৫। অর্থাৎ ২০০৮ সালের শেষে ভারতীয় সংবিধানে ৩৯৫টি (গাণিতিক বিচারে ধারার সংখ্যা ৪৪৭) ধারা এবং ১২টি তালিকা আছে।

বিশালাকার বিশিষ্ট হওয়ার কারণ ।। ভারতীয় সংবিধান বৃহদায়তনবিশিষ্ট হওয়ার পিছনে কতকগুলি কারণ আছে। (ক) এই সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং সকল রাজ্য সরকারের শাসনব্যবস্থা, ক্ষমতা, কার্যাবলী প্রভৃতি সকল বিষয়ের বিশদ আলোচনা আছে। (খ) শাসনকার্যের মূলনীতিগুলির উল্লেখ ছাড়াও সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। (গ)সংবিধানে মৌলিক অধিকার ছাড়াও নির্দেশমূলক নীতি এবং কতকগুলি মৌলিক কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত আছে। (ঘ) তফসিলী জাতি ও উপজাতির জন্য কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধার কথা সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে। (ঙ) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ে সংবিধানে বিশদ আলোচনা আছে। (চ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বহু বিষয় ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (ছ) ভারতের আয়তন বিশাল এবং সমস্যাদি বহু, বিভিন্ন ও জটিল। এই সমস্ত কিছুর সুষ্ঠু সাংবিধানিক সমাধান করতে গিয়ে সংবিধানের কলেবর বেড়েছে। (জ) ভারতের সংবিধানে এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ও মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত সরকারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তার ফলে সংবিধানের আকার বেড়েছে। (ঝ) ভারতের সংবিধানে এমন কিছু বিষয় আছে যা সংসদীয় আইনের দ্বারা নির্ধারণ করা যেত। উদাহরণ হিসাবে রাষ্ট্রকৃত্যক, সরকারী ভাষা প্রভৃতির কথা বলা যায়। এর ফলেও সংবিধান দীর্ঘতর হয়েছে। (ঞ) গ্রানভিল অস্টিন (Granvile Austin)-এর মতানুসারে ভারতের সংবিধান রচয়িতাদের মধ্যে একটি অংশ সংবিধানে সবকিছু বিস্তারিতভাবে বিধিবদ্ধ করার ব্যাপারে নিরন্তর চাপ সৃষ্টি করে গেছেন। তার ফলেও সংবিধান বড় হয়েছে। এইসব কারণে ভারতের সংবিধান বিষয়বহুল এবং জটিল হয়ে পড়েছে। ভারতের সংবিধানের বিশালায়তনের কারণ প্রসঙ্গে সংবিধান বিশারদ কাশ্যপ (S. C. Kashyap)-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। *Our Constitution* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন : ''This happened because the Government of India Act, 1935, which was after all basically a statute, was used as a model and an initial working draft and large portions of it got reproduced in the Constitution. Also, the constitution makers did not want to leave certain matters subject to doubts difficulties and controversies to be handled by future legislation.''

বৃহদাকার সম্পর্কিত মতামত ।। গণপরিষদের খসড়া-কমিটির সভাপতি আম্বেদকর (Dr. B. R. Ambedkar)-এর মতানুসারে সংবিধানে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাদি বিস্তারিতভাবে বিবৃত থাকলে সংবিধানকে বিকৃত করা যাবে না। কারণ যাই হোক না কেন ভারতের সংবিধান হল বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান। বিচারপতি মহাজন (Justice J. Mahajan) বলেছেন : ''No country in the world has such an elaborate and comprehensive constitution as we have in this country.'' এ প্রসঙ্গে শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ (Kamath) গণপরিষদে এক তির্যক মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতানুসারে গণপরিষদের প্রতীক হিসাবে হাতিকে গ্রহণ করা হয়েছে। এবং এই প্রতীকের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ভারতের সংবিধান হয়েছে বিশালাকার। তিনি বলেছেন : ''The emblem and the crest that we have selected for our Assembly is an elephant. It has perhaps in consonance with that our Constitution too is the bulkiest that world has produced.'' যাই হোক এ বক্তব্য একটি বৃহদায়তনবিশিষ্ট দীর্ঘতম সংবিধান

Scanned with CamScanner

আদর্শ হতে পারে কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে। অনেকের মতে সংক্ষিপ্ত আকারই হল আদর্শ সংবিধানের একটি বড় গুণ। অধ্যাপক হোয়ার (K. C. Wheare) বলেছেন : ''The essential characteristics of the ideally best form of constitution is that it should be as short as possible.''

(২) সংবিধানের প্রাধান্য ∫∫ ভারতে সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের সংবিধান হল দেশের মৌলিক ও সর্বোচ্চ আইন। সরকারের যাবতীয় ক্ষমতার একমাত্র উৎস হল এই সংবিধান। সংবিধান আইন-বিভাগ, শাসন-বিভাগ ও অন্য সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বে। সরকার সংবিধান-বিরোধী আইন প্রণয়ন করলে সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিল করে দিতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট এরকম বহু আইন অসাংবিধানিকতার দায়ে বাতিল করে দিয়েছে।

(৩) সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা আছে ∫∫ প্রস্তাবনা হল ভারতীয় সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মার্কিন সংবিধানের প্রস্তাবনার অনুকরণে এর সৃষ্টি। প্রস্তাবনাকে সংবিধানের মুখবন্ধ বা ভূমিকা বলা হয়। এতে সংবিধানের উৎস, আইনগত ভিত্তি, নৈতিক আদর্শ ও মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকে। এই প্রস্তাবনা থেকেই সংবিধান রচয়িতাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। ভারতীয় সংবিধানের শুরুতেই যে প্রস্তাবনাটি আছে, তাতে সংবিধানের উৎস বা ভিত্তি, মৌলিক আদর্শ, মূল লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। প্রস্তাবনায় ভারতকে 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তা ছাড়া সংবিধানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হিসাবে ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্ব, ব্যক্তির মর্যাদা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 'সমাজতান্ত্রিক', 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সংহতি'—এই তিনটি শব্দ প্রস্তাবনায় সংযুক্ত করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের মূল দর্শন হল প্রস্তাবনা ∫∫ এই প্রস্তাবনাই হল ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক দর্শন। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এখানে সর্বকালের উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আদর্শগুলিকে সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। অধ্যাপক বার্কার (Barker) এই প্রস্তাবনাকে 'Testament of his old age' বলে অভিহিত করেছেন। সংবিধানের কার্যকরী অংশের এমন সুন্দর ভূমিকা খুব কমই দেখা যায়। G.C.Venkata Subba Rao মন্তব্য করেছেন : ''The spirit of the ideology behind the constitution is sufficiently crystalised in preamble.''

(৪) সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ∫∫ সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারত রাষ্ট্রকে একটি 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' (Sovereign Socialist Secular Democratic Republic) হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ দুটি ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় সংযুক্ত হয়েছে।

(ক) সার্বভৌম ∫∫ ভারতকে সার্বভৌম বলা হয়েছে। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিক দিয়েই ভারত সার্বভৌম। দেশের অভ্যন্তরে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ভারত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতরাষ্ট্র বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সর্বপ্রকারে মুক্ত। ভারত স্বাধীনভাবে তার পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করে। ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ কোন কোন সমালোচকের মতে কমনওয়েলথের সদস্যপদ ভারতের সার্বভৌম চরিত্রের বিরোধী। কারণ কমনওয়েলথের প্রধান হিসাবে ব্রিটেনের রাজা বা রানীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়। কিন্তু এই সমালোচনা অমূলক। ব্রিটেনের রাজা বা রানী হলেন কমনওয়েলথের প্রতীকী প্রধান। তা ছাড়া কমনওয়েলথের সদস্যপদ স্বেচ্ছামূলক। সর্বোপরি ভারতের আভ্যন্তরীণ শাসন এবং পররাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয়। ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রানীর নামও উচ্চারণ করা হয় না।

(খ) সমাজতান্ত্রিক ∫∫ ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতকে সমাজতান্ত্রিক বলা হয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ অর্থে ভারত সমাজতান্ত্রিক। এ দেশে মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবে কার্যকর করার ব্যবস্থা সংবিধানে গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতি জাতীয়করণ, রাজন্যভাতা বিলোপ প্রভৃতি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। তবে পরিপূর্ণ অর্থে সমাজতন্ত্র বলতে যা বোঝায় তা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রচলিত সামাজিক কাঠামোয় তা সম্ভবও নয়। ভারতে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এবং এই রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে কিছু শিল্পের জাতীয়করণ এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) ধর্মনিরপেক্ষ ∫∫ ভারতীয় সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ভারতে কোন ধর্ম নেই বা ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই একথা বোঝায় না। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ, এর অর্থ হল এখানে কোন বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকার করা হয়নি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচরণ, ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে সকলেই স্বাধীনতা ভোগ করে। ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র পরিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ। তবে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে এই অধিকারের উপর রাষ্ট্র কিছু যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ

Scanned with CamScanner

আরোপ করতে পারে। তবে রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মের কোন ভূমিকা নেই। ধর্মীয় রাজনীতি রাষ্ট্রের কাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কোন শ্রেণীবিভাগ করা যায় না। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা হয়েছে। ভারতরাষ্ট্র কোন ধমর্কে লালন করে না। এখানে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে কিছু নেই। ধর্ম এখানে ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে গণ্য হয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্ম বিচার্য বিষয় হিসাবে গণ্য হয় না। সকল ব্যক্তি কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ মেনে চলে বিবেকের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার ভোগ করবে। রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না। ভেঙ্কটরমণ (Venkataraman) বলেছেন: "The state is neither religious, nor irreligious, nor anti-religious, but is wholly detached from religious dogmas and activities and thus neutral in religious matters." ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ (Radhakrishnan) ভারতকে 'অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র' (non-communal state) বলে অভিহিত করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতা হল ভারতের সনাতন আদর্শ।

(ঘ) গণতান্ত্রিক ∫∫ ভারতের শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ভারতের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ হল রাজনৈতিক গণতন্ত্র। দাবি করা হয় যে এখানে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা, সৌভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি আদর্শের উপর ভিত্তি করে ভারতে ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সমালোচকদের মতানুসারে এখানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অর্থনৈতিক শোষণ, ব্যাপক ধনবৈষম্য, দারিদ্র্য, বেকারত্ব প্রভৃতি এখনও দেশে প্রকট। আবার অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অভাবের জন্য ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও গণতন্ত্র অর্থবহ হয়ে উঠতে পারেনি।

(ঙ) সাধারণতান্ত্রিক ∫∫ ভারতের শাসনব্যবস্থার শীর্ষে আছেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির পদ বংশানুক্রমিক নয়, নির্বাচনমূলক। এই কারণে ভারতকে প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র বলা হয়। অনেকের অভিযোগ হল ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য। তাই ভারতকে ইংল্যাণ্ডের রানীর প্রাধান্য স্বীকার করতে হয়। এ বিষয়টি ভারতের প্রজাতন্ত্রী চরিত্রের বিরোধী। কিন্তু এ যুক্তি ঠিক নয়। কমনওয়েলথের সদস্যপদ হল স্বেচ্ছামূলক। ভারত ইচ্ছা করলেই এই সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারে। বস্তুতঃ নিজের স্বার্থেই ভারত এর সদস্য আছে। ভারতে রাষ্ট্রপতিই হলেন দেশের প্রশাসনিক প্রধান। তাঁর নামেই দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। সংবিধানে ব্রিটিশ রানীর কোথাও কোন উল্লেখ নেই। সর্বোপরি ভারত স্বাধীনভাবে তার পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করে। সুতরাং কমনওয়েলথের সদস্যপদ ভারতের প্রজাতান্ত্রিক চরিত্রের পরিপন্থী নয়।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ∫∫ ভারতের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়। সংবিধানের কোথাও কিন্তু ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়নি। ২৮টি অঙ্গরাজ্যের সমন্বয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এখানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয়েছে। এই ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের পদ্ধতি অনন্য। কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা—এই তিনটি তালিকার মাধ্যমে এখানে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের, রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর রাজ্য সরকারের এবং যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর উভয় সরকাবেরই যুগ্ম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় ∫∫ ক্ষমতা-বণ্টনের নীতি অনুসারে ভারতের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে পড়েছে। মূল সংবিধানে কেন্দ্রীয় তালিকায় ৯৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। বর্তমানে বিভিন্ন সংবিধান সংশোধনী আইনের পরিপ্রেক্ষিতে গাণিতিক বিচারে কেন্দ্রীয় তালিকায় মোট বিষয়ের সংখ্যা ১০০টি। এই বিষয়গুলিতে আইন প্রণয়নের অনন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রকে। মূল সংবিধানে রাজ্যের হাতে দেওয়া হয় মাত্র ৬৬টি বিষয়। সংবিধানের ৭ম (১৯৫৬) ও ৪২তম (১৯৭৬) সংবিধান সংশোধনী আইন অনুযায়ী ৫টি বিষয় রাজ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। মূল সংবিধানে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল ৪৭টি বিষয়। রাজ্য তালিকা থেকে ৫টি বিষয় বাদ দিয়ে যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করায় বর্তমানে যুগ্ম তালিকার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৫২। ফলে রাজ্য তালিকায় বিষয়ের সংখ্যা এখন প্রকৃতপক্ষে ৬১। আবার যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের আইনই প্রাধান্য পায়। কারণ রাজ্যের আইন কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে রাজ্যের আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটি বাতিল হয়ে যায়। আবার নির্দিষ্ট কতকগুলি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়েও হস্তক্ষেপ করতে পারে। তা ছাড়া এই তিনটি তালিকার বহির্ভূত সকল অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) কেন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য ছাড়াও জরুরী অবস্থার সময় ভারতীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামো সম্পূর্ণ এককেন্দ্রিক রূপ ধারণ করে। তা ছাড়া একটি সংবিধান, একনাগরিকতা, একটি বিচার-বিভাগ প্রভৃতি ভারতের শাসনব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক করে তুলেছে। ভারতের সংবিধানে প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রকে সুস্পষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই

Scanned with CamScanner

কারণে অধিকাংশ সংবিধান-বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল যে, ভারতীয় শাসনব্যবস্থা কাঠামোগত বিচারে যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও প্রকৃতিগত বিচারে এককেন্দ্রিক। ড. আম্বেদকরের মতে এ শাসনব্যবস্থা হল আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়। অধ্যাপক হোয়ার (K. C. Wheare) বলেছেন : ''In the class of quasi-federal constitutions it is probably proper to include the Indian Constitution of 1950.'' বস্তুতপক্ষে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে সংবিধান-বিশেষজ্ঞ কাশ্যপ (S. C. Kashyap) তাঁর *Our Constitution* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : ''The text of the Constitution does not anywhere use the term 'federal' or 'federation'. The supreme Court has spoken of the Indian union as 'federal', 'quasi-federal' or 'amphibian' meaning sometimes 'federal' and sometimes 'unitary' (**State of Rajasthan V. Union of India, AIR 1977 SC 1361**)।

(৬) **পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা—দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা** ∫∫ গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার অনুকরণে ভারতেও পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভারতে প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে আছেন একজন রাষ্ট্রপতি। তিনি হলেন নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব শাসক-প্রধান। তাঁর হাতে প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা নেই। দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন একটি মন্ত্রিপরিষদ। পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়েই মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। এই মন্ত্রিপরিষদকে শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে পার্লামেন্টের কাছে এবং বিশেষত পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। এই যৌথ দায়িত্বশীলতার জন্যই ভারতের শাসনব্যবস্থাকে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা বলা হয়। ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই সংসদীয় বা দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরেই সরকারী নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে মন্ত্রিসভা। কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি ও অঙ্গরাজ্যগুলিতে রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকা পালন করেন। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী শাসন-বিভাগের প্রকৃত প্রধান হিসাবে দায়িত্ব সম্পাদন করেন। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুসারে এখানে শাসন ও আইন-বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতারাই মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সংসদই হল সার্বভৌম। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মাতৃভূমি ব্রিটেনের মত এদেশেও মন্ত্রিসভা তথা প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য অতিমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার ফলে সংসদের ভূমিকা বহুলাংশে গৌণ হয়ে পড়েছে। তাই অনেকের মতে ব্রিটেনের মত ভারতেও প্রধানমন্ত্রীর শাসন কায়েম হয়েছে।

আবার অনেকের মতে ভারতে মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এঁদের মতানুসারে ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি নির্বাচিত হন। সংবিধান অনুসারে তিনি হলেন দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধানে আইনগত বিচারে রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শমত কাজ করতে বাধ্য করা হয়নি। রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার এই রকম কিছু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের জন্য কেউ কেউ ভারতের শাসনব্যবস্থাকে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণ বলে মনে করেন। কিন্তু ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তবে ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার কোন পরামর্শ পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাতে পারেন। কিন্তু পুনর্বিবেচনার পর রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে হয়। এই সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার পর ভারতের সংবিধানের সংসদীয় চরিত্র সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কাশ্যপ (S. C. Kashyap) তাঁর *Our Constitution* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : ''In a highly pluralistic society with India's size and diversity and with many pulls of various kinds, they believed that the parliamentary form was the most suited for accomodating a variety of interests and building a united India.''

(৭) **মৌলিক অধিকার—ছয় শ্রেণীর মৌলিক অধিকার** ∫∫ ভারতীয় সংবিধান কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে মার্কিন শাসনব্যবস্থাকে অনুসরণ করেছে। এই রকম একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হল একটি পৃথক অধ্যায়ে কতকগুলি মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্তি। ভারতীয় সংবিধানে কতকগুলি মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) সংযুক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ১২ থেকে ৩৫ ধারার মধ্যে ছয় শ্রেণীর মৌলিক অধিকার নাগরিকদের দেওয়া হয়েছে। এই অধিকারগুলি হল : (ক) সাম্যের অধিকার, (খ) স্বাধীনতার অধিকার, (গ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (ঘ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, (ঙ) সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্পর্কিত অধিকার এবং (চ) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার। গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের স্বার্থে এই অধিকারগুলি অপরিহার্য। এই সমস্ত নাগরিক অধিকার ছাড়া গণতন্ত্র টিকে

Scanned with CamScanner

থাকতে পারে না। তা ছাড়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য এই অধিকারগুলির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই অধিকারগুলি হল ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি। প্রদত্ত অধিকারের মাধ্যমেই একটি রাষ্ট্রের প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। অধ্যাপক ল্যাস্কি (H. Laski) বলেছেন : "A State is known by the system of rights it maintains." সংবিধানে লিখিতভাবে অধিকারগুলির স্বীকৃতির ফলে নাগরিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিশ্চয়তা লাভ করেছে। প্রত্যেক নাগরিকের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার যথাযথ বিকাশের জন্য এই অধিকারগুলি দরকার। অধিকারগুলিকে সকলের কাছে সহজলভ্য করার জন্য সংবিধান অধিকারগুলির উপর কতকগুলি সীমা আরোপ করেছে। এই অধিকারগুলি অবাধভাবে ভোগ করা যায় না। কোন দেশেই অবাধভাবে অধিকার ভোগ করা যায় না। কারণ অবাধ অধিকার স্বৈরাচারের নামান্তর। ভারতীয় সংবিধানেও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অধিকারগুলির উপর যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তবে অনেকের মতে কয়েকটি বিধিনিষেধ অগণতান্ত্রিক।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মূল সংবিধানে সাত শ্রেণীর মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ ছিল। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনে (১৯৭৮) সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সম্পত্তির অধিকার এখন একটি সাধারণ আইনগত অধিকারে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে তাই ভারতীয় সংবিধানে ছয় শ্রেণীর মৌলিক অধিকার আছে।

ভারতের সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারগুলির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারের বিল (Bill of Rights)-এর ব্যাপক সাদৃশ্য আছে। ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের জন্য কোন অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকার করা হয়নি। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

(৮) নির্দেশমূলক নীতি — অসংরক্ষিত অধিকার ।। মৌলিক অধিকার ছাড়াও ভারতীয় সংবিধানে আরও কতকগুলি অধিকার অন্তর্ভুক্ত আছে। এগুলিকে রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles of State Policy) বলে। আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের অনুকরণে নীতিগুলি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৬ থেকে ৫১ ধারার মধ্যে নীতিগুলি উল্লিখিত আছে। কতকগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই হল নীতিগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। উদাহরণ হিসাবে কর্মের অধিকার, বার্ধক্য, অক্ষম ও পীড়িত অবস্থায় সরকারী সাহায্য পাওয়ার অধিকার; পর্যাপ্ত জীবিকার অধিকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এগুলি হল : (ক) সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত নীতিসমূহ, (খ) শাসন কাঠামোর উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতিসমূহ, (গ) প্রগতিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত নীতিসমূহ এবং (ঘ) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন সম্পর্কিত নীতিসমূহ। কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য নয়। তবে এই কারণে নীতিগুলি একেবারে মূল্যহীন নয়। নীতিগুলির পিছনে জনমতের সমর্থন থাকে। জনকল্যাণমূলক ভারতরাষ্ট্র গঠনের জন্য নীতিগুলি অপরিহার্য বিবেচিত হয়। তাই কোন সরকারই এগুলিকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। অস্টিন (Granville Austin)-এর মতানুসারে ভারতের সামাজিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে নীতিগুলির ভূমিকা পরিপূরক। জেনিংস (Ivor Jennings)-এর অভিমত হল ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে নির্দেশমূলক নীতিগুলি হল অসংরক্ষিত অধিকার।

(৯) ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ।। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের অস্তিত্ব। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সম্ভাব্য বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংবিধান অনুসারে ভারতেও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত আছে। এর নাম সুপ্রীম কোর্ট। সংবিধানের ব্যাখ্যা, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিবাদের মীমাংসা প্রভৃতি কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব এই সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত থাকে।

ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করলে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান আদালতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে। মার্কিন শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি স্বীকৃত হয়েছে। তা ছাড়া মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' (Due Process of Law) এবং 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি' (Procedure established by Law) অনুযায়ী মামলা-মোকদ্দমার বিচার করে। তাই কংগ্রেস-প্রণীত কোন আইন অসাংবিধানিক বা ন্যায়নীতির বিরোধী হলে সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিল করতে পারে। আবার ব্রিটেনে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। তাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা ব্রিটেনের আদালতের নেই। কিন্তু ভারতে কতকগুলি বিষয়ে পার্লামেন্ট এবং অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভা কর্তৃক

Scanned with CamScanner

প্রণীত আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট অন্যান্য বিষয়ে আইন-বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে না।

(১০) বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ।। ভারতের বিচার-বিভাগ যাতে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে, তার জন্য সংবিধানে বিচার-বিভাগীয় স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিচারপতিদের নিয়োগ, কার্যকাল এবং সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে সংবিধান বিচার-বিভাগকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। তবে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের তুলনায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা কম। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা বেশী।

(১১) সংসদীয় সার্বভৌমত্ব ও বিচার-বিভাগীয় প্রাধান্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ।। ভারতে মোটামুটিভাবে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ভারতের সংবিধান হল দেশের মৌলিক ও সর্বোচ্চ আইন। পার্লামেন্ট এই সংবিধান সংশোধন করতে পারে। ভারতের পার্লামেন্ট সংবিধান-নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অনন্য ক্ষমতা ভোগ করে। পার্লামেন্ট অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে এবং শাসন-বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় সংবিধানে পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতার নীতি এবং বিচার-বিভাগের প্রাধান্যের নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টারী সার্বভৌমিকতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-বিভাগীয় প্রাধান্য এই দুই চরম ব্যবস্থার মধ্যে ভারতীয় সংবিধানে মধ্য পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করা হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ আইন-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ পার্লামেন্টকে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আবার পার্লামেন্ট প্রণীত আইন এবং শাসন-বিভাগীয় ও অন্যান্য নির্দেশের সাংবিধানিকতা বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বিচার-বিভাগকে। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনে আদালতের এই ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে সুপ্রীম কোর্ট সেই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ বাতিল করে দিয়েছে।

(১২) ভারতীয় সংবিধান অংশত সুপরিবর্তনীয় এবং অংশত দুষ্পরিবর্তনীয় ।। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হয়। আবার সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল হলে তা সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে এবং সময়োপযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে না। ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয়। কিন্তু এই সংবিধান পুরোপুরি দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ সংরক্ষণের জন্য ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়গুলির পরিবর্তন পদ্ধতি জটিল। যেমন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত সংশোধনী প্রস্তাব সংসদের উভয় কক্ষের মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা সমর্থিত এবং অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভার অন্ততঃ অর্ধেকের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের জন্য তেমন কোন জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় না। যেমন মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত সংশোধনী প্রস্তাব সংসদের উভয় কক্ষের মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা সমর্থিত হওয়া দরকার। তা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতেই সংবিধান সংশোধন করা যায়। কোন রাজ্যের সীমানা বা নাম পরিবর্তন, নতুন রাজ্য সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত বিল সংসদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে পাস হয় এবং পরিবর্তন কার্যকর হয়। এই কারণে ভারতীয় সংবিধান অংশতঃ সুপরিবর্তনীয় কিন্তু বৃহত্তর অংশে দুষ্পরিবর্তনীয়। এই সংবিধান মার্কিন সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয়তা এবং ব্রিটিশ সংবিধানের সুপরিবর্তনীয়তার মধ্যে সার্থক সমন্বয় সাধন করেছে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত পদ্ধতিই কাম্য বলে বিবেচিত হয়। এ হল সুশাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপক হোয়ার (K. C. Wheare) ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির বৈচিত্র্যকে সঙ্গত বলে সমর্থন করেছেন। শ্রী দুর্গাদাস বসু বলেছেন: "Another distinctive feature of the Indian Constitution is that it seeks to impart flexibility to a written federal constitution.

(১৩) অনুন্নত শ্রেণীর স্বার্থে বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ—তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের অনুকূলে বিশেষ ব্যবস্থা ।। ভারতে সাম্যের আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। এই আদর্শকে কার্যকর করার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করার কথা বলা হয়েছে। তবে ভারতের অনুন্নত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংবিধানে বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। এই ব্যবস্থাগুলিকে বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ-ব্যবস্থা বলা হয়। তফসিলভুক্ত জাতি ও তফসিলভুক্ত উপজাতিদের (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) স্বার্থে সংবিধানেই বিশেষ নির্দেশ আছে। উদাহরণ হিসাবে আইনসভায় আসন সংরক্ষণ, সরকারী চাকরিতে পদ সংরক্ষণ, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ আর্থিক আনুকূল্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আবার তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত

Scanned with CamScanner

অঞ্চলগুলির শাসন এবং সমস্ত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সংবিধানে এই বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ-ব্যবস্থা প্রথমে দশ বছরের জন্য স্বীকৃত হয়েছিল। তারপর বার বার সংবিধান সংশোধন করে এই বিশেষ ব্যবস্থার মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৪০ বৎসর করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত এটি কার্যকর থাকার কথা। ৬২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভায় তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের আসন সংরক্ষণের মেয়াদ আরও ১০ বছর বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই বর্ধিত মেয়াদ ২০০০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তারপর এই সংরক্ষণের মেয়াদ ১৯৯৯ সালে ৭৯তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ২০১০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বাড়ান হয়েছে। তা ছাড়া তফসিলী সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ আদালত গঠনের ব্যাপারে রাজীব গান্ধীর আমলে ১৯৮৯ সালে বিল পাস হয়। এই আইনের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপের আমলে ১৯৯০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে জেলায় জেলায় এই বিশেষ আদালত তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(১৪) **একনাগরিকত্ব** ।। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের একনাগরিকত্ব স্বীকার করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থার রীতিমাফিক দ্বি-নাগরিকত্ব এখানে স্বীকৃত হয়নি। ভারতের জনগণ সকলেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। এখানে কোন অঙ্গরাজ্যের নাগরিকত্ব স্বীকার করা হয়নি। অর্থাৎ এখানে প্রাদেশিক নাগরিকত্ব বলে কিছু নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সুইস যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ও তার নিজের অঙ্গরাজ্যের নাগরিকত্ব অর্জন করে। একে দ্বি-নাগরিকত্ব বলে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে ভারতে দ্বি-নাগরিকত্ব স্বীকার করা হয়নি।

(১৫) **মৌলিক কর্তব্য— এগারটি মৌলিক কর্তব্য** ।।ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের কতকগুলি মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ আছে। নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ ভারতীয় সংবিধানের একটি নতুন বৈশিষ্ট্য। মূল সংবিধানে এই বৈশিষ্ট্য ছিল না। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতের সংবিধানে দশটি মৌলিক কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের সনাতন আদর্শ এবং চীনের মত সমাজতান্ত্রিক দেশের সংবিধানকে অনুসরণ করা হয়েছে। সংবিধানের ৫১-ক ধারায় উল্লিখিত দশটি মৌলিক কর্তব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সংবিধান মান্য করা, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য ও সংহতি সমর্থন ও সংরক্ষণ করা, দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করা, নারীজাতির মর্যাদা হানিকর প্রথা পরিহার করা, জাতির মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা, জাতীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা, হিংসার পথ পরিহার করা প্রভৃতি। ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে ৮৬তম সংশোধনী আইন অনুসারে চতুর্থ অধ্যায় 'ক' অংশের ৫১-ক ধারায় আরও একটি মৌলিক কর্তব্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারফলে মৌলিক কর্তব্যের মোট সংখ্যা দশ থেকে বেড়ে এগার হয়। নতুন সংযোজিত কর্তব্যটি হল: ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ হল মাতাপিতা বা অভিভাবকের মৌলিক কর্তব্য। কিন্তু এই কর্তব্যগুলি মান্য করার ক্ষেত্রে তেমন কোন বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করা হয়নি।

(১৬) **কতকগুলি রাজ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা** ।। ব্রিটিশদের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সকল দেশীয় রাজ্য তত্ত্বগত বিচারে স্বাধীনতা লাভ করে। ৫৫২টি দেশীয় রাজ্য ভারতে যোগদান করে। এগুলির অধিকাংশই অঙ্গরাজ্যগুলির অংশ হিসাবে যুক্ত হয় এবং ভারতীয় ইউনিয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। এখন দেশীয় রাজ্যগুলির আর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই।

ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলি এবং পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হয়। কিন্তু সকল রাজ্যের জন্য একই রকম ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি। সংবিধানের ৩৭০ ধারায় কাশ্মীরের জন্য এবং ৩৭১ ধারায় অসম, মণিপুর, সিকিম, নাগাল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের স্বার্থে কিছু বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ আছে।

(১৭) **সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার** ।। ভারতীয় সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি। সংবিধানের ৩২৬ ধারায় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধান অনুসারে জাতি, ধর্ম, শিক্ষা, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে ২১ বছরের কম বয়স্ক নয় এরকম প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকেরই ভোটাধিকার আছে। বর্তমানে ২১ বছরের সীমাকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়েছে।

(১৮) **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণ** ।। ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী বিধিবিধানের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও অধিকারের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। ভারতে একদিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বেসরকারী উদ্যোগ এবং উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পিত অর্থনীতি, সরকারী উদ্যোগ, আর্থ-সামাজিক সাম্য প্রভৃতি স্বীকার ও প্রয়োগ করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

ভারতে ব্যাঙ্ক, বীমা ও কিছু শিল্প জাতীয়করণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ এই দুই পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি প্রসঙ্গে কোন সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করা যায় না। সামগ্রিক বিচারে ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য হল সমষ্টিকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ভিত্তি হল 'মিশ্র অর্থব্যবস্থা' (Mixed Economy)। ভারতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প-বাণিজ্যের ব্যবস্থার পাশাপাশি সরকারী উদ্যোগকে স্বীকার করা হয়েছে।

(১৯) জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত ব্যবস্থা ∫∫ ভারতের সংবিধানে জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার সংস্থান আছে। স্বাভাবিক প্রশাসনিক ক্ষমতার দ্বারা জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করা যায় না। তাই সকল দেশেই জরুরী অবস্থায় দেশের শাসন-বিভাগীয় প্রধানের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির হাতে তিন ধরনের জরুরী অবস্থাকালীন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ৩৫২ ধারা থেকে ৩৬০ ধারার মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

(২০) বিশ্বশান্তির আদর্শ ∫∫ ভারতের সংবিধানে সৌভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তির আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের ৫১ ধারায় বলা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি, জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক রক্ষা, আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধির প্রতি শ্রদ্ধাবৃদ্ধি ও সালিশীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসার ব্যাপারে রাষ্ট্র উদ্যোগী হবে। আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিকতার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কথা ভারতের সংবিধানে আছে।

(২১) লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের সংমিশ্রণ ∫∫ ভারতের সংবিধান হল বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান। এতদ্‌সত্ত্বেও এই সংবিধান সর্বাংশে লিখিত নয়। প্রকৃতপক্ষে কোন সংবিধানই পুরোপুরি লিখিত বা পুরোপুরি অলিখিত হতে পারে না। ভারতের সংবিধানেও কিছু অলিখিত অংশ আছে। এই সংবিধানে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্রিটেনের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুসারে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ, দেশের শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য, সংসদীয় সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তঃরাজ্য সহযোগিতা, রাজ্যপাল মনোনয়ন, রাজ্যপালদের সম্মেলন, মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন প্রভৃতি সম্পর্কিত ব্যবস্থাদিও ভারতীয় সংবিধানের উল্লেখযোগ্য অলিখিত অংশ।

(২২) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অস্বীকৃতি ∫∫ ভারতের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে স্বীকার করা হয়নি। ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অনুকরণে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানে আইন, শাসন ও বিচার-বিভাগের এক্তিয়ার মোটামুটি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই তিনটি বিভাগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নীতি বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

(২৩) ভাষা সম্পর্কিত ব্যবস্থা ∫∫ ভারত হল একটি বহু ভাষাভাষী দেশ। ভারতবাসীদের মধ্যে মোটামুটি ১,৬৫২টি ভাষা প্রচলিত দেখা যায়। এই সমস্ত ভাষার মধ্যে এক লক্ষের অধিক মানুষ কথা বলে এ রকম ভাষার সংখ্যা আঠার। এই আঠারটি ভাষা সংবিধানের অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ভাষার অস্তিত্ব যাতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বিরোধী না হয় সে বিষয়ে সংবিধান রচয়িতারা সতর্ক ছিলেন। তাই সংবিধানের সপ্তদশ অধ্যায়ে (Part XVII) ৩৪৩ থেকে ৩৫১ ধারার মধ্যে ভাষা সংক্রান্ত সাংবিধানিক নির্দেশের উল্লেখ আছে।

(২৪) দলত্যাগ-বিরোধী ব্যবস্থা ∫∫ ১৯৮৫ সালে ৫২তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে দলত্যাগ বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে এই ব্যবস্থা ভারতের সংবিধান তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থার এক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রকে সুস্থ ও সুদৃঢ় করার জন্য এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

কাশ্যপের অভিমত ∫∫ ভারতের সংবিধান-বিশেষজ্ঞ কাশ্যপ (S.C. Kashyap)-এর অভিমত অনুযায়ী ভারতের সংবিধান হল একটি বিশেষভাবে সুসংবদ্ধ দলিল। এই সংবিধান হল অভিনব। এর অভিনবত্ব নানা দিক থেকে। ভারতের সংবিধানকে নির্দিষ্ট কোন ধাঁচে ফেলা যাবে না। এই সংবিধান হল একই সঙ্গে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত ও মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত শাসনব্যবস্থার এক অভিনব সমাহার। ভারতের সংবিধান ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ভারসাম্য রক্ষা করেছে। তা ছাড়া এই সংবিধান সংসদীয় সার্বভৌমত্বের সঙ্গে বিচার বিভাগীয় প্রাধান্যের সমন্বয় সাধন করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে বেশ কিছু দেশের সংবিধান বিলীন হয়ে গেছে বা বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতের সংবিধান সাফল্যের সঙ্গে সংকটের মোকাবিলা করেছে। কাশ্যপ তাঁর *Our Constitution* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "This itself is evidence of its resilience, dynamism and growth potential."

Scanned with CamScanner